সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ জীবন ও সৃজন

দিলীপ সাহা

ভেতরে - ভেতরে তাঁর মনের মধ্যে বিবর্তনের পালাবদল একটা চলছিল অনেকদিন ধরেই। আশির দশকে রীতিমতো ঘোষণা করে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট পার্টিও। এমন কী সাধারণ মানুষের মতো চলে যাবারইচ্ছে সত্ত্বেও ছিনতাইয়ের কবল থেকে মুক্তি পায়নি তাঁর শবদেহও। এ সবই সত্যি । তবু ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরের স্বাতন্ত্র্যধর্মী, প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সৈনিক, চল্লিশের দায়বদ্ধ প্রত্যয়ী পদাদিক, অবিস্মরণীয় প্রবাদপ্রতিম পঙ্‌ক্তির স্রষ্ট, শৈলীকুশলী সর্বোপরি বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক হিসেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসে নির্দ্বিধায় স্মরণযোগ্য।

আমার মনের মধ্যে জন্মগত ছবি একটা আছে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম নদিয়ার কৃষ্ণনগরে, মামার বাড়িতে, ১৯১৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, বুধবার, মাঘ সংক্রান্তিতে। তাঁর স্পষ্ট স্বীকারোক্তি
স্পষ্ট মনে আছে। স্থান কৃষ্ণনগর। মা-র পেট থেকে আমি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসেছিলাম।
স্মৃতিজড়ানো সেই জলছবির প্রতিভাস কাল মধুমাস কবিতায়

কী করে জানি না ---
আমার মনের মধ্যে জন্মগত ছবি একটা আছে
একেবারে শীতের শেষদিন।
পাতা নেই গাছে।
দুটি ঠোঁট শব্দ তুলে অন্য দুটি ঠোঁটে
বলে ওঠে
মনে নেই ? কাল মধুমাস।

বাবা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর মা যামিনী দেবীর ছ-টি সন্তানের মধ্যে বেঁচেছিলেন মাত্র দু-ভাই আর এক বোন - সবার বড়ো দিদি, দু-ভাইয়ের মধ্যে ছোটো সুভাষ। ক্ষিতীশচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত সুপুষ। টানা নাক। তীক্ষ্ণ চোখ-মুখ। ঘন কোঁকড়া চুল। গায়ের রং সাহেবদের মতো ফরসা। একটু লালচে। সুভাষের কথা তো ওঠেই না, এমনকী তার দাদা - দিদিরাও কেউ বাবার রং পায়নি। মা যামিনী দেবী তো কালো। সুভাষও কালো। তাই বাবা তাকে ডাকতেন কালো বলে। অবশ্য ঠাকুর্দার দেওয়া নাম গোবিন্দ।
ক্ষিতীশবাবু ঘুষ নিতেন। সেটা গোটা পরিবারের সবারই গর্ব

আবগারি - দারোগা হয়ে বাবার যে নামডাক এত ---
দাদা বলত, কী জন্যে বল্ তো ?
কারণ, নেন না বাবা ঘুষ।

নওগাঁর বেআইনি আর বেকানুনি লোকেরা জেনে গয়েছিল যে, আর যাই হোক ক্ষিতীশবাবু অন্তত ঘুষের কারবারে নেই। আত্মকথায় সুভাষ লিখেছেন বাবার সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা

বাবার নাক ছিল বেশ লম্বা। হাজার চাপাচুপি দিলেও, কোনো কিছুতে ঘুষের নামগন্ধ থাকলে ঠিক তিনি ধরে ফেলতে পারতেন। এসব ব্যাপারে বাবার সাংঘাতিক রকমের শুচিবাই বাড়ির আর কেউ খুব একটা পছন্দ করত না।তারা বলত, আদর করে কিংবা খাতির করে কেউ যদি পুকুরের পাকা ই, বাগানের ফল, তরকারি কিংবা দোকানের দইমিষ্টি পাঠায় --- সেটাকেও ঘুষ বলে ধরে নিয়ে পত্রপাঠ ফেরত পাঠানোর কোনো মানে হয় ? এটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি ?

কর্মজীবনে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ ক্ষিতীশচন্দ্র কৃতি ছাত্রও ছিলেন। সুভাষ জানিয়েছেন

বঙ্গবাসীতে বাবা ছিলেন গিরিশ বোসের ছাত্র। সে - আমলে ললিত বাঁড়ুজ্যে বাংলা পড়াতেন। বাবা লেকাপড়ায় ভালো ছিলেন (সব বাবাই লেখাপড়ায় ভালো হয়)। ইন্টারমিডিয়েটের টেস্টে বাবা নাকি হয়েছিলেন সেকেন্ড। আর তখনকার ডাকসাইটে ছাত্র পঞ্চানন মিত্র ফার্স্ট। আবগারিতে চাকরি জুটে যাওয়ায় ফাইনাল পরীক্ষা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। ঠাকুর্দা তখন রিটায়ার করায় বড় ছেলে হিসাবে বাবার ঘাড়ে এসে পড়েছিল সংসারের ভার। একটা ভালো যে, এসব নিয়ে বাবাকে কখনও আপসোস করতেশুনিনি।

ঠুকুমাকে তারা কেউই চোখে দেখেনি। তবে ছেলেবেলা থেকে বাব আর টুকুরর্দার মধ্যে বৈরী সম্পর্ক সুভাষের নজর এড়িয়ে যায়নি

কাজ থেকে অবসর নেওয়ার পর ...বৈতরণী পার হওয়ার জন্যে ঠাকুরদা কোনো গু ধরেননি। ধর্মসভায় যাওয়া, শাস্ত্রপাঠ শোনা --- এ সবের তাঁর বালাই ছিল না। বাড়িতে পুজো - আর্চা করারও কোনো বাতিক দেখিনি। ঠাকুর - দেবতাকে ভক্তি করা, হিন্দু ধর্মকে বড় মনে করা, সনাতন প্রথাগুলোকে মান্য করা -- অথচ কোনো কিছু নিয়েই খুব একটা বাড়াবাড়ি নয়। মিলিয়ে ঠাকুরদা ছিলেন একজন সাধারণ ছা- পোষা মানুষ।
বাবার সঙ্গে ঠাকুরদার চরিত্রের ছিল এইখানেই তফাত। বাবার মধ্যে ছিল সবকিছুতেই একটা বাড়াবাড়ির ঝোঁক। যা করতেন তাই চুটিয়ে। অগ্র - পাশ্চাৎ ভাবা তাঁর কুষ্ঠিতে লেখা ছিল না। সামাল দিতে নাপারলেও একা নিজের ঘাড়ে বিরাট সংসারের ভার নিয়েছিলেন। যৌথ পরিবারের পায়ের নিচে যখন মাটি সরে যাচ্ছে, তখনও বালির বাঁধ দিয়ে তা ঠেকানোর কী নিরন্তর তাঁর চেষ্টা। ঘুষ না নেওয়ার ধনুর্ভঙ্গ পণ। অথচ সামান্য মাইনে। সুতরাং পোষাবার জন্যে কেস করে রিওয়ার্ড পাওয়ার ধান্দায় কেবলি বাড়ির বাইরে এখানে সেখানে ছুটে বেড়াতে হচ্ছে।

এই বাবার কাছেই সুভাষের জীবনের প্রথম পাঠ, আর আদৌ ইংরেজি না-জানা মায়ের কাছে শিক্ষার পাঠ। মা যামিনীবালা দেবী কৃষ্ণনগরের অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। মা-র বাবা, দাদামশাই কালীমোহন বাড়ুজ্যে সে-কালের নামকরা ডাক্তার। সহকারি সিভিল সার্জেন। ভাইবোনদের মধ্যে যামিনী দেবী ছিলেন সবার ছোটো এবং সাবার আদরের। ছেলেবেলায় কেষ্টনগরে মেমসাহেবদের স্কুলে তিনি বাংলা পড়েছেন। সুন্দর করে বলতে পারাই নয়, তাঁর কথাই ছিল মিষ্টি। ব্যবহারিক বুদ্ধিও বেশ প্রখর। আর পাষাণের মতো সহ্যশক্তি। বাবা তো মাসকাবারে মাইনের টাকাটা মার হাতে ধরিই খালাস।

এদিকে পুরো সংসারের বোঝা চাপার ফলে অশান্তি ছিল নিত্যসঙ্গী। তথাপি সে - অভাব কাউকে কোনোদিন তিনি বুঝতে দেননি। সমস্ত ঝড়ঝাপটা সামলেছেন একা। ফোঁড়া দিয়ে দিয়ে ছেঁড়াফাটা সংসারটা তো চালাতে হবে তাঁকেই

মা-র বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। খরচ কমাবার জন্যে মা এমন ধোঁকার ডালনা রাঁধতেন যে, মাছের কথা ভুলে গিয়ে বাড়ির সবাই হাপুস হুপুস করে ভাত খেয়ে নিত। দুধের অভাব ভোলবার জন্যে মা তো আমাদের খুব শৈশবেই চা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। আমিষের খরচ বাঁচাতে আরেকবার চালু করে দিলেন রাত্তিরে চন্দৌসির আটার টি আর রসগোল্লার পায়েস। সবাই তো মহাখুশি।

মা-র কাছে শিখেছিলাম, ভাতের সঙ্গে আর কিছুই যদি না জোটে, এক - পলা সর্ষের তেল, নুন আর কাঁচা লঙ্কা কিংবা লঙ্কা পোড়া ---- ব্যস্। তার কাছে কোথায় লাগে নামী - দামী চর্বচোষ্য।

মা ছিলেন সুভাষের কাছের মানুষ। বড়োই সাদাসিধে। হাতে লোহা চাড়া ক্ষয়ে ক্ষয়ে পাতলা হয়ে যাওয়া একগাছি মাত্র সোনার চুড়ি। পরনে আটপৌরে লালপাড়া সাদা শাড়ি। বিলাসিতা বলতে গরমের দিনে বিকেলে গা ধুয়ে গায়ে একটু পাউডার ঢালা। রাত্তিরে কখন তিনি খেতেন কেউ টের পেত না। বাবা রাত্তিরে বাড়ি ফিরে আসার পর বিছানায় যখন সুভাষদের অর্ধেক রাত্তির। খালি মেঝেয় শোওয়া, রোদে পোড়া, বৃষ্টিতে ভেজা, নুনতেললঙ্কা মেখে শুধু ভাত খাওয়া---এ সবই সুভাষের মার কাছে শেখা। ফলে, জীবনে কষ্টকে কখনো কষ্ট বলে মনে হয়নি।

নাওগাঁয় না গেলে মা-র চরিত্রের আর এক দিক সুভাষের কাছে সম্পূর্ণ অজানাই থেকে যেত। ঘটনাটা এইরকম

মা-র কোনো দামি রঙিন শাড়ি ছিল না। থাকলেও অন্তত আমরা কখনও পরতে দেখিনি। বাইরে কোথাও গেলেপরতেন লালপাড় তাঁতের সাদা শাড়ি। গায়ের রং কালো হলেও মা-র খুব ভালো মুখশ্রী ছিল।চোখে মুখে খুব লাবণ্য ছিল।

একবার এক বিয়েবাড়িতে গিয়েছেন। সেখানে এক অফিসারের বউ মা- সাদাসিধে সাজসজ্জা দেখে এবং তারপর হাত দুটো ধরে মুখের কাছে এনে নাকি বলেছিলেন, এ মা। হাত - দুটোও যে একদম খালি। তোমার স্বামী বুঝি তোমাকে ভালোবাসে না ?

ব্যস্, তারপরই বাড়ি ফিরে মা জানিয়ে দিয়েছিলেন, এর পর থেকে আর কখনও তিনি কোনো নেমন্তন্ন- বাড়িতে যাবেন না। এরপর বাবাও কখনও মাকে তাঁর ইচ্ছের বিদ্ধে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে কোনো জোরজার করেননি।

বাবা যে ঘুষ নেন না, সে ব্যাপারে মার মনে মনে একটা গর্ব ছিল। মুখে না বলে ভাবভঙ্গি দিয়ে সেই বোধটা ছেলেমেয়ের মধ্যেও তিনি চারিয়ে দিয়েছিলেন।

একান্নবর্তী পরিবারের হাজারো ঝক্কি, তাদের ব্যারাকের বাসায় তল্পিতল্পা নিয়ে বাইরে থেকে আসা অতিথিদের সব ঠেলাই তো সামলাতে হত মা- কে। অথচ কোনো বিপদ বা ঝড়ের সংকেত পেলে এই মায়েরই অন্য চেহারা।তখন মায়ের মুখে মন্ত্রধ্বনির মতো বাজতে জয়মণি! স্থির হও।
কিন্তু তবু যখনই বৃষ্টিতে ঝড়ে
চমকাত বিদ্যুৎ
পাশে এসে মা বলতেন হেঁকে
জয়মণি ! স্থির হও।

সে - মন্ত্র তো মার কাছেই শেখা।

৫০ নম্বর নেবুতলার গলির সঙ্গে গলাগলি

রাজশাহির নওগাঁয় যাওয়ার আগে বছর তিন - চার বয়স অব্দি সুভাষের শৈশব কেটেছিল কলকাতায়, ৫০ নম্বরনেবুতলার গলিতে। গলিটা ছিল এমন যে, সেখানে নিজের চোখে কেউ কোনোদিন সকাল হতে দেখেনি। মনে আছে হেসপাইপে গলাফাটানো ঘোলা জলে রাস্তায় বান ডাকানোর শব্দ বাঁশের চোঙ - লাগানো চৌবাচ্চায় কলকণ্ঠে সকালের প্রথম জল আসার আওয়াজ, গলির দরজায় বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতো করে সাতসকালে ঠিকে ঝির জোরে জোরে কড়া নাড়া, কলকাতার এঁটো বাসনের দিকে চোখ রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাশের বাড়ির কার্নিশে বসা কাকের গলা-চরা কা - কা। সূর্যের মুখ দেখা না গেলেও এইসব বিচিত্র শব্দের সকাল হত নেবুতলার গলির। তারপর রাস্তা দিয়ে একে একে মিছিল করে যাওয়া শু করত বস্তির ঠিকে - ঝি, জলকলের মিস্ত্রি আর বিশাল বিশাল হাতা খুন্তি কড়াই কাঁধে নিয়ে হালুইকরের দল।

এ পাড়ার অনেক বাড়িই ছিল পুঁয়ে - পাওয়া ক্ষয় - খর্বটে । চোয়ালের হাড় - বার - করা গাড়ি বারান্দাগুলোর জন্যেই সুভাষদার ভাড়াবাড়িটাও কেমন যেন লাগত কোলকুঁজোর মতো। একতলার রোয়াকে দাঁড়িয়ে বারান্দাগুলোকে যেন লাফ দিয়ে ছোঁয়া যায়। এই গুণটুকুর জন্যেই চড়কের রাতে জেলেপাড়ার সং দেখতে এ গলিতে ভেঙে পড়ত বাইরের লোক। সে সময় সুভাষের আকর্ষণের বস্তু ছিল বাড়ির রাঁধুনি বামুন ওড়িশার মোহন, তার মুখের পান, বনেদি পরিবারের বাড়িওলা অদ্ভুত মানুষ জ্যাটামশাই, অপূর্ব সুন্দরী জ্যাঠাইমা, হাপু গান আর ঠাকুর্দার ক্যাশবাক্স ওটা ছিল আমাদের কাছে গুপ্তধনের মতোই দাণ কৌতুহলের বিষয়। ওতেই থাকত বাড়ির সবারই কুষ্ঠি। হলতে কাগজ, তাতে লালা কালিতে লেখা। গোল করে মোড়ানো। বাড়ির মেয়েদের কম কৌতূহল ছিল না। তার একমাত্র কারণ, ঠাকুর্দা ক্যাশবাক্সের চাবিটা পৈতের সুতোর বেঁধে রাখতেন এবং ক্যাশবাক্সটাকে সবসময় আগলে বেড়াতনে। কলকাতা ছাড়ার সেই পর্বে, স্মৃতির মণিকোঠা। হাতড়ে ঠাকুর্দার এই ক্যাশবাক্স নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর কাহিনি শুনিয়েছেন সুভাষ পরম কৌতুকে

বেলা বাড়লেও তখনও ঠিক দুপুর হয়নি। ঠাকুর্দার ক্যাশবাক্সটা খোলা। ...সেদিন সেজোকাকা না ছোটকাকা, কেআমার মনে নেই --- সিঁড়ির ধাপগুলো লাফ দিয়ে টপ্‌কে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে ঠাকুর্দাকে চাপা গলায় খরবর দিয়েছিলেন, ভীষণ ব্যাপার। শাঁখারিটোলা পোস্টাপিসে ডাকাতি হয়ে গেছে।

শোনা মাত্র ঠাকুর্দা তড়িঘড়ি তাঁর ক্যাশবাক্সের খোলা ডালাটা দড়াম করে বন্ধ করে আগে চাবি আঁটলেন। তারপর অন্য কথা।

রাস্তায় তখন লোকে ছোটাছুটি করছে। কয়েকবার গুলি ছোঁড়ার শব্দও নাকি শোনা গেছে।

পরে জানা গেল, ডাকাত নয়। যারা হানা দিয়েছিল তারা স্বদেশী। তারা নাকি মুহুর্মুহু বন্দে মাতরম বলে চেঁচিয়েছিল। ...

ঠাকুর্দা মারা গিয়েছিলেন তারও প্রায় দু-দশ পরে। কিন্তু ক্যাশবাক্সটার সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কটা শেষদিন পর্যন্ত বজায় ছিল।

নাম নওগাঁ

আজ মফস্বলে এক নগণ্য শহর

কলকাতাকে বিদায় জানিয়ে উত্তর বাংলার মহকুমা শহর নওগাঁ যাবার একটা আনন্দ ছিল। কারণ, বাড়িওলা জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা বাদে বাবা মা দাদা দিদি, ঠাকুর্দা, কাকারা, প্রিয়জনেরা --- প্রায় উপুড় - করা গোটা সংসারটাই তো যাচ্ছে নওগাঁয়। শেয়ালদা থেকে গাড়ি যখন ছাড়ল তার আগেই বুকের কাছে ব্যাঙের আধুলির মতো একটা পুঁটুলি দুহাতে বুকে আঁকড়ে ধরে সুভাষ তখন ঘুমিয়ে ঢোল। সান্তাহার জংশন স্টেশন ট্রেন-সব এসে থেমেছে। আর একগাদা

লটবহরের মধ্যে মা-র আঁচল ধরে শীতে জুবুথবু হয়ে কোলে বসে ছেলে সুভাষ দেখেছিল তার জীবনের রাত পুইয়ে সেই প্রথম সকাল হতে। আঃ, জীবনের প্রথম সকাল। রাত ফরসা হওয়ার পর রেলওয়ে লোকোশেডের মাথার ওপর লাজুক অ াকাশের গলা সবে যখন লাল হতে শু করেছে, এমন সময় লোকজন নিয়ে হই হই করতে করতে তাদের নিতে এলেন দীনেশ জ্যাঠামশাই। সুভাষের আত্মদর্শন -এ উদ্ভাসিত সে -অনুভাবের চিত্র

যাচ্ছি নওগাঁয়।
পরে ভুগোলের বইতে পড়েছি --- সান্তাহার থেকে বেরোলেই বগুড়া জেড়ে রাজশাহীতে পা দেওয়া।
সেটা ছিল ইংরিজি বছরের প্রথম দিন। নতুন বছরের একেবার পয়লা দিনেই নতুন জায়গায়।

জেলা বদ্‌লে ছুটে চলেছে মাথায় ছত্রিবিহীন একঘোড়ার আর দু-চাকার টমটম। দাদার হাসিখুশির পাতা থেকে উঠে আস া সেই এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে। ভয়ে চুপটি করে মার কোলের মধ্যে দু-হাঁটু আঁকড়ে বসে আছি।

দু পাশে তাকিয়ে সব গিলছি। আকাশে মেঘের খেলা। ধূ ধূ করছে আঠ। আঁটি - আঁটি খড়। মাটির বাড়ি। ডোবাপুকুর। র াস্তার ধারে ভেজা ঘাস । বড় বড় রেন্ট্রি গাছ। টেলিগ্রাফের তারে বসা ল্যাজঝোলা পাখি।

কলকাতা থেকে নওগাঁয় এক অজানা নতুন জগতে সুভাষের সেই প্রথম পা দেওয়া।
বদলির চাকরির দন ক্ষিতীশবাবু বরাবরই পরিবার থেকে একটু দূরে দূরেই থাকতেন ফলে ছেলে - মেয়ে তাঁকেভয় করত। নওগাঁর কোয়ার্টারে পা দিয়ে সেই জেদি মানুষটার অন্যবিধ পরিচয়ে পরিবার যথারীতি তাজ্জব। স্মৃতির সরণিতে সমুজ্জ্বল সেই অনুভবের কথা লিখেছে সুভাষ ঐকান্তিক আগ্রহে

আমাদের নিয়ে আসার কিছুদিন আগেই বাবা নওগাঁয় এসে কাজে জয়েন করেছিলেন। এই একা থাকার সময় শীতবসন্ত না বঙ্গে বর্গী কী একটা নাটকে যেন বাবা গান গেয়েছিলেন, আর অলীকবাবু গোছের প্রহসনে করেছিলেন কোনো একটা কমিক রোল।

আমরা যখন গিয়েছি তখনও শহরের লোকের মুখে - মুখে ফিরছে বাবার গান গাওয়া লোক হাসানোর কথা।

আমরা বাড়ির লোকেরা কিন্তু এই শোনা কথায় কখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। বাড়িতে একটু - আধটু গুনগুন করলেও থিয়েটারের স্টেজে উঠে গলা ছেড়ে বাবা মহাসিন্ধুর ওপার থেকে গাইছেন, এতো ভাবাই যায় না।

আর তার চেয়েও অবিশ্বাস্য ছিল কমিক রোলে বাবার অভিনয়।
এই গুণ উত্তরাধিকার সূত্রে আত্মস্থ করেছিল দাদা, ভাইপো - ভাইঝি সহ সুভাষও।
সুভাষ তখন ছাড়া - গো। কারণ তখনও তার হাতেখড়ি হয়নি। আসলে হিসেব কষে বয়সমতো স্কুলে ভর্তি করার অতশ হুঁশ ছিল না বাবা - মার। অবশেষে আট বছরের ধাড়ি ছেলেকে ধরে বেঁধে পুরে দেওয়া হল মাইনের স্কুলের খোঁয়াড়। দাদ া - দিদির দেখাদেখি সুভাষও বই নিয়ে বসে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে র-জ-নী রজনী। রজনী মানে, যে আমাদের দুধ দেয়। শী-ত-ল শীতল। শীতল মানে, ধোপা। আস্তে আস্তে এলেম বাড়ে। সুভাষ ফার্স্ট হয়। জয়দেব সেকেন্ড। কাশীরাম থার্ড। জয়দেব ছিল জাতে কামার। আর সরকারি বাগানের মালির ছেলে কাশীরাম। এরা দুজনেই সুভাষের খুব বন্ধু। আরও একজনের সঙ্গে তার ভাব হয়েছিল। গাঁয়েক এক এক মুসলমান খেতালের ছেলে। বয়সে ওদের চেয়ে ঢের বড়ো। বসত ল াস্ট বেঞ্চিতে। বাধত। উঁচু জাত নীচু জাত তো বটেই, বিদ্যেবুদ্ধিতেও কে ছোটো কে বড়ো, এমনকী ঘটি- বাঙাল থেকে শু করে মেঘনার এপার - এপার, এ - জেলা সে- জেলা, এ - অঞ্চল সে - অঞ্চল --- বাদ যেত না কিছুই। এইসব ভেদবুদ্ধিতে

সুভাষের মন কেমন যেন কুঁকড়ে থাকত। কেননা সব জাতে আর সব অঞ্চলেই যে তার পড়ার আর খেলার সাথি ছড়ানো।

ক্রমে মন বসে। দিনগুলোও রঙিন হতে থাকে। হকারের কাছ থেকে কাগজ এনে ঠাকুর্দার হাতে পৌঁছে দেওয়া, গান গাওয়া, আবৃত্তি করা, মা-র সাথে কেষ্টনগরে যাওয়া, মামার বাড়িতে পদ্মপাতায় ভাত খাওয়া, অধর ময়রারদোকানে সুরপুরিয়া আর সরভাজার গন্ধ, মটরদা, রানিদির কথা, মেজোকাকার বিয়ে উপলক্ষে দল বেঁধে দমদমে বরযাত্রী যাওয়া, সন্ধের পর বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসা গল্পের আসরে মা-র ছড়া ও পকথার গল্প বলা, বৃষ্টির পর ভেজা মাটি থেকে ওঠা সোঁদা গন্ধ বুক ভরে নেওয়া, হ্যাটকোট পরা বাবাকে গোরা সাহেব ভেবে তাড়াতাড়ি দরজার পেছনে লুকিয়ে পড়া, কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুয়ো থেকে বালতি তোলার মজা দেখা, সেজোকাকার হাতে ছিপে তোলা ট্যাংরা মাছের কাঁটা ফোটার যন্ত্রণা, রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফুটবলের স্বপ্ন দেখা, ঠাকুরদার চেঁচিয়ে পড়া দোহাবলী, বক্স ক্যামেরায় ছবি তোলা, খেলার মাঠ জুড়ে বসা জমিদারের হাতির শুঢ় দোলানোরকেতা, মনীদির কথা, দিদির বিয়ে, যমুনা নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরা, দিদির বন্ধু কুট্টিদির পা দুলিয়ে দুলিয়েছড়া বলা, দর্শনায় জাবেদ চাচার গাড়ি চড়ার মজা, পল্লীব্যথা-র কবি খাটিকাকা সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের জ্ঞাতিত্ব, মোনা ঠাকুরের মা সেজোমা -র নিখুঁত সময় জ্ঞান, ক্ষ্যাপাদার অসাধারণ সব হাতের কাজ -- স্মৃতির ক্যানভাসে ভেসে ওঠা উত্তর বাংলার নওগাঁয় সুভাষের ছেলেবেলার এবম্বিধ জীবনছবি ছিল সততই সুখের। এ চিত্র যেমনবর্ণময়, তেমনি প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। ধীরে ধীরে এখানকার পাটও চুকল। সময় হল, নোঙর তোলার

হঠাৎ একদিন জানা গেল, বাবা নাকি শীগগিরই কলকাতায় বদলি হচ্ছেন। বছর ঘুরবার দু-চার মাসের মধ্যেই।
আমরা চলে যাব তার আগে। আমরা বলতে ঠাকুরদা, দাদা, আমি আর লিলি। অ্যানুয়াল পরীক্ষা শেষ করে। যাতে নতুন সেশনের গোড়াতেই আমরা নতুন ইস্কুলে ভর্তি হয়ে যেতে পারি।
মা মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিলেন --- কাকিমার কাছে কয়েকটা মাস থাকবি। তারপরই তো আমরা এসে পড়ে সবাই একসঙ্গে ব্যারাকের বাড়িতে গিয়ে থাকব।
ধরা গলায় নওগাঁকে বলি জীবনের পয়লা খেল্ খতম।

কলকাতা এমন একটা জায়গা, যা কখনও পুরনো হয় না
আট বছর অদর্শনের পর আবার ফিরতে হল সেই কলকাতায়, সুভাষের বয়স তখন এগারো কি বারো। এবার মেজোকাকার বাসায়, বাঞ্ছারাম অত্রুর লেনে। মধ্য কলকাতার সেই এঁদো গলিতে দিন দুপুরে আলো জ্বেলে বসে থাকতে হয়। স্যাঁতসেঁতে দেয়াল। ঘরে বসে টেরও পাওয়া যায় না, কখন কীভাবে দিনরাতের পালাবদল হচ্ছে। কানে বাজে কলের কলকাতার বিচিত্র সব শব্দধবনি। ঠিকে ঝি-র কড়ানাড়ার শব্দ থেকে শু করে মধু লেবে গো ? মধু ? বা মাটি আছে ! মাটি ! বলে ফিরিওলাদের হাঁকডাক। পাড়া ঘুরতে বেরিয়েও স্বাস্তি নেই। খালি পা, গায়ে গোলকিপারের জার্সি মার্ক ফুলহাতা গেঞ্জি পরা তাকে দেখে পাড়াগেঁয়ে ঠাউরে, তার ওপর বাঙালে টানে ট্যাংড়া ছেলেরা এমন পেছনে লাগল যে, শেষ পর্যন্ত পালিয়ে বাড়ি ফিরতে হল। মনটা বড়ো দমে গেল। এই কিশোরের মনে হল নওগাঁকে তো আর ফিরে পাবে না, কাজেই লোহার বেড়ি পায়ে দিয়ে ইট-কাঠের এই রাজত্বেই তাকে মাথা গুঁজে থাকতে হবে।

এঁদো গলিতে থাকতে থাকতে এই কিশোর ভুলেই গিয়েছিল আকাশের কথা। এক পশলা বৃষ্টির পর বাড়ি ফেরার পথে একদিন গ্যাসের আলোয় জলজমা রাস্তার খোঁদলে তার চোখে পড়ে। নিচু হয়ে তাকিয়ে দেখে, চাঁদসুদ্ধু গোটা আকাশটা লুটিয়ে পড়েছে তার পায়ে। যে-আকাশটা ইটের পাঁজয় এতদিন ঢাকা পড়ে গিয়েছিল, সে যেন হঠাৎ ঘোমটা খুলে তার পায়ের কাছে এসে ধর্না দিয়ে পড়ল। দম বন্ধ করা মনটা নিমেষে তার উচছল হয়ে ওঠে মুক্তির অনাবিল আনন্দে। তখন তারের গায়ে ঝুলে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা দেখে তার মনে হয়েছিল ঠিক যেন কোনো কিশোরীর নাকের নোলক।

এইসময়ে আর একদিনের ঘটনা। রামনাথ কবিরাজের গলি ছেড়ে এই কিশোর সবে পা দিয়েছে নেবুতলায়, হঠাৎ যেচে

একজন শোনো ভাই বলে তার হাত ধরে বলল, কচুকাওয়াজ করতে যাচ্ছি আমরা হৃষীকেশ পার্কে। যাবে ভাই, আমাদের সঙ্গে ? তাঁর সাথে তারই মতো কমবয়সি একদল ছেলে। দাদা - গোছের সেই লোকটি তাকে ভাববার কোনো সুযোগ না দিয়ে চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এ শহরে এর আগে কেউ এভাবে তাকে আপন করে কাছে টানেনি। এই প্রথম কলকাতাকে তার ভালো লাগল। ইতিমধ্যে এই কিশোর ভর্তি হয়েছে ক্লাস ফাইভে। মেট্রোপলিটন স্কুলে, বউবাজার শাখায়।

১৯৩০ সাল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সে এক অগ্নিগর্ভ সময়। গোটা দেশ তখন উত্তেজনায় অধীর। উত্তাল। ইংরেজের বিদ্ধে গান্ধিজির অসহযোগ আনোদালনের ডাক, বিলিতি কাপড় পোড়ানো, মদের দোকানে পিকেটিং, সত্যাগ্রাহীদের দিয়ে জেল ভরানো, পাড়ায় পাড়ায় মিছিল, মুহুর্মুহু বন্দে মাতরম ধবনি, পুলিশের লাঠি, রাইটার্সেরবারান্দায় বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের সশস্ত্র যুদ্ধ, বো-স্ট্রিটের মোড়ে ফুটপাতে ঢেলে বিত্রি হওয়া ভগৎ সিং, বটুক্বের দত্তের ছবি, চট্টোগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের নায়ক মাস্টারদার লড়াই -- ঘটনাবহুল জীবন সংগ্রামে মুখর ত্রান্তিকালের সে-াথ্যায়। গরম হয়ে ওঠা কলকাতার সেই ঝোড়ো দিনে ঠাকুর্দাকে জপিয়ে এই কিশোরও কিনে ফেলেছে একটা গান্ধিটুপি আর কেটা তক্‌লি।

এদিকে খবরের কাগজ তখন বন্ধ হয়ে গেছে। পাড়ার বুড়োদের তো মাথায় হাত। কী নিয়ে তারা গজালি করবে।মওকা বুঝে কিশোর সুভাষ তখন রাতারাতি পাড়ার গেজেট। তার একমাত্র কাজ সারাদিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেকবে কোথায় পিকেটিং হল, পুলিশের লাঠি চলল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার খবর জোগাড় করা। নেবুতলার মোড়ে টাঙানো হাতে লেকা রোজকার বুলেটিনও তার মুখস্থ। কলকাতার বাইরের খবরও তাতে থাকত। জেলের ভেতরেকী ঘটছে, মিলত সে-খবরও। স্বভাবতই পাড়ায় বুড়োদের আসরে তার তখন কী কদর! এই যে খোকা বলে যারা ডাকত, তারাও জেনে গেল তার নাম। স্কুলের রোয়াকে বুড়োদের বিকেলের বৈঠকে সুভাষই একমাত্র অর্বাচীন।

বউবাজার আর নবুতলার মোড়ের কাছে তখন ছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অফিস। সামনের ফুটপাতে হাফপ্যান্ট-পরা সেই কিশোরও রোজকার মতো দাঁড়িয়ে। পাশেই একটা প্রাইভেট গলি। ঠিক তার মুখে দাঁড়িয়েছিল জনা কয়েক ছেলে - ছোকরা। গলির দিকে মুখ বাড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তারা চেঁচিয়ে ওঠে, বন্দে মাতরম ! ততক্ষণে রাস্তার ভিড় ফুলে - ফেঁপে একশা। আটকে গেছে গাড়ি-ঘোড়া। প্রাইভেট গলিটা দিয়ে রে রে করে এসে পড়েছে লাল পাগড়ি পরা বিরাট পুলিশ বাহিনী। গোটা তল্লাট জুড়ে তখন একটাই আওয়াজ বন্দে মাতরম। লাল পাগড়ির মাথা গরম। বাড়িওলার ছোটো ভাই বলাইবাবু সহ বেশ কয়েকজনকে পুলিশের গাড়িতে চালান করে দেওয়ার পর যখন ভিড়ের ওপ লাঠি চলছে, তখন হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ি ফিরে বলাইবাবুর গ্রেপ্তার হওয়ার হাতে - গরম খবরটা কাকিমাকে সেই কিশোরই দিয়েছে সবার আগে। শুনে কাকিমা তার হাতদুটো ধরে ব্যগ্রতায় বলেছিলেন, চাল্‌ গনু -- আমাকেও নিয়ে চল্‌। আমি জেলে যাব। গৃহবন্দিনী কাকিমার সেই আবেগের কথা এই কিশোর ভোলেনি। দিন কয়েক পর বাড়িওলার সঙ্গে আলিপুর জেলে তার স্বচক্ষে দেখা খবরের কাগজের ছবি থেকে সদ্য উঠে আসা সুভাষচন্দ্র বসুকে। স্কুলে ভর্তি হবার সময় মেজোকাকা ওঁর নামেই তার ভালো নাম রেখেছিলেন।

এই সময় টাইফয়েডে তার একেবারে যাই-যাই অবস্থা। যমে - মানুষে টানাটানির পর্ব কাটিয়ে পুনর্জন্ম ঘটলেও সেই অসুখের ধাক্কায় তাকে হারাতে হয়েছিল তিনটি জিনিস গানের গলা। চোখের নজর। আর স্মৃতিশক্তি।

তিরিশের সেই দশকে দুনিয়া জুড়ে দেখা দিয়েছিল ভয়ংকর এক অর্থনৈতিক সংকট। তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে তাদের পারিবারেও। মেজোকাকার জুটমিলের চাকরি চলে যায়। কমে যায় বাবার মাইনেও। কারণ সরকারের নাকি দৈন্যদশা চলছে। ফলে বউবাজারের এক্সাইজ ব্যারাকের বড়ো বাড়ি ছেড়ে তাদের উঠে আসতে হয় দক্ষিণের শহরতলিতে। এই কারণেই মেট্রোপলিটান স্কুল ছেড়ে সুভাষকে ভর্তি হতে হয় সত্যভামা ইন্সটিটিউশনে, সপ্তম শ্রেণিতে। এরপর নবম শ্রেণিতে

ভবানীপুর মিত্র স্কুলে। এখানে শিক্ষক হিসেবে কবিশেখর কালিদাস রায় এবং কালি - কলম পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুর সঙ্গে গড়ে ওঠে তদার সুমধুর সম্পর্ক। সহপাঠীরাও উল্লেখ্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রামনাথ রায়, পরিমল সেনগুপ্ত, রামকৃষ্ণ মৈত্র, নির্মল চ্যাটার্জি।১৯৩৭ সালে এই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সুভাষ ভর্তি হন আশুতোষ কলেজে।সেখান থেকে ১৯৩৯-এ আই এ, ১৯৪১-এ স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি এ পাস করেন। দর্শন নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ-তে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কারণে সুভাষের এম এ পরীক্ষা আর দেওয়া হয়ে ওঠেনি।

মানবতা আর দেশাত্মবোধ থেকে রাজনীতি মোটেই দূর - অস্ত নয়

উত্তাল চল্লিশের সেই ত্রান্তিলগ্নে সামাজিক দায়বদ্ধতায় সুভাষ বিশ্বাস করতেন, রাজনীতি নিছক কোনো নীতি নয়, মূলত তা জীবনবোধেরই বিশিষ্ট ভঙ্গি। স্বভাবতই ছাত্রজীবন থেকেই রাজনীতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অমোঘ । তাই ১৯৩২ - ৩৩ সালে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিশোর ছাত্রদল-এর কার্যকলাপের সঙ্গে। আশুতোষ কলেজে আই এ পড়ার সময় আলাপথারিতার সূত্রে কবি সমর সেন তাঁকে পড়তে দেন হ্যান্ডবুকঅব মার্কসিজম, যে-বই তাঁর পুরোনো ধ্যানধারণা আমূল বদলে দিয়ে তাঁর গোটা জীবনটাকেই বইয়ে দিয়েছিল নতুন খাতে। ১৯৩৯ সালে তিনি সরাসরি যুক্ত হন লেবার পার্টির সঙ্গে। পরে ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জির সঙ্গে আলোচনান্ত্রে লেবার পার্টি ছেড়ে তিনি যোগ দেন ভ ারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। সক্রিয় রাজনীতি আর পার্টির কাজ করতে করতেই লাভ করেন পার্টির সদস্যপদ। সেটা ১৯৪২ সাল। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন, পার্টির কর্মসূচী, প্রস্তাব, রণকৌশল, রণনীতির বাইরে রাজনীতি থেকে তাঁর প্রান্ত্রি উৎস দেয়ালে পোস্টার মারা, অফিসঘর ঝাঁট দেওয়া, মিছিলে গলা মেলানো, কাগজে ডাকটিকিট সাঁটা, খেত-খাম ারে কল - কারখানায় কাজ করা,বস্তিতে আর কুঁড়ে ঘরে, মাদুরে আর ছেঁড়া কাঁথায় শোয়ার অভিজ্ঞতা। সর্বোপরি কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখার চোখ দিয়েছে, অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার সাহস জুগিয়েছে, লাগসই শব্দ দিয়ে আমার মুখে সচিত্র বোল ফুটিয়েছে। (আমি ছেড়ে যাইনি, খোলা হাতে খোলা মনে, ১৯৮৭, পৃ. ১৫)

আসলে রাজনীতিকে বাদ দিয়ে জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা নেহাতই বাতুলতা মাত্র। রাজনীতি তো জীবনের বৃহৎ কর্মযোগের সঙ্গে অন্বিত। জীবন আর রাজনীতি যে অভিন্ন, একসূত্রে গাঁথা, সেকথা সুভাষ জানিয়েছেন দ্বিধাহীন কণ্ঠে

দেশের স্বাধীনতা চাওয়া, শ্রেণীর তফাত ঘুচিয়ে দেওয়া --- এসব যে রাজনীতির ব্যাপার, আগে একটা জানতাম না। ছেলেবেলায় আমরা রাজনীতি বলতে একমাত্র বুঝতাম কর্পোরেশনের ভোটাভুটি কিংবা আরেকটু বড় হয়ে, সুভাষ বোস-জে. এম. সেনগুপ্তের ঠোকাঠুকি। দেশের মাটি আর মানবতা -- এ দুটোই মন মজানোর জিনিস। ভোটাভুটি দেশাত্মবোধ থেকে রাজনীতি মোটেই দূর - অস্ত্ নয়। কাঙালী দরজায় এলে ভিক্ষে দিয়ে তাকে বিদায় করলাম। কেউ সেই মন-কাঁদাকে রাজনীতি বলবে না। কিন্তু অতই যদি দরদ থাকে, শুধু তাকে চোখের সামনে থেকে তখনকার মত বিদায় করেই ক্ষান্ত হব ন া। দারিদ্র্যকে বিদায় করার পথ দেখতে হবে। তখনই চলে াসাবে রাজনীতির কথা এবং তাকে কাজে ফোটাবার জন্য দল বঁ াধার কথা। দরটাকে মুখের বদলে বুকের মধ্যে এবং তাৎক্ষণিকের বদলে বরাবররের করে নেবার কাব্যটাই হবে রাজনীতি। এ রাজনীতির সত্তা আমার কবিতার সত্তা থেকে পৃথক নয়। রাজনীতি ছোট জিনিষ নয়। তাকে যখনই ছোট করে দেখি, তখনই আমরা ছোট হয়ে যাই। অসুবিধেটা সেখানেই।
(কবি মনন ও কাব্যচিন্তা প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অন্যমনে, শরৎকালীন সংখ্যা ১৩৭৬, পৃ.৮৮)

বিশ্বাস আদর্শ আর ভালোবাসার টানেই তিনি মার্কসবাদী। বিয়াল্লিশের সেই সন্ধিক্ষণে, যন্ত্রণাবিদ্ধ সময়ে আপাদমস্তক তিনি ডুবেছিলেন রাজনীতিতে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশন, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙঘ, প্রগতি লেখক ও গণন াট্য সঙঘ -এর সঙ্গে তাঁর তখন নিবিড় সংযোগ। পার্টির মুখপত্র জনযুদ্ধ -র সর্বক্ষণের কর্মী, সাংবাদিক হিসেবে ঘুরেছেন ব াংলার প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চল, কাজ করছেন স্বাধীনতা পত্রিকাতেও। সেই সঙ্গে নির্মাণ করেছেন সাংবাদিক গদ্যের নতুন

শৈলী।

১৯৪৮ -এ কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে বহু কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। দমদম জেলে বন্দিদের সেই বিখ্যাত ৪৭ দিনের অনশন ধর্মঘটে শামিল হয়েছিলেন তিনিও। তবে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, দমদম থেকে বদলি হয়ে বক্সায় নাৎসীদের কমসেন্ট্রেশন ক্যাম্প -এর মতো কাঁটাতারের সেই বেড়াজালের আস্তানায় ইস্পাতকঠিন সংগ্রামী পরভেজ আব্দুর রেজ্জাক খান, অগ্নিদিনের কথা-র বিপ্লবী সতীশ পাকড়াশী, অধ্যাপক উর্দু কবি পরভেজ শহীদী, তেভাগার গল্প - বলা চা মজুমদার, হুগলির গিরিজা মুখার্জি, গল্পের অফুরন্ত ভাণাডারী চিন্মোহন সেহানবীশের সঙ্গলাভ। অবশেষে দীর্ঘ আড়াই বছরের কারাবাস থেকে তাঁর মুক্তিলাভ, ১৯৫০ সালের নভেম্বরে।

এরপর ঘটনাবহুল জীবন। জেল থেকে বেরিয়ে আর্থিক অনটনে পড়া, ১৯৫১ সালে পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনার দা য়িত্বভার, শ্রীমতি গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রেজিষ্ট্রি বিয়ে, বার্লিন যুব-উৎসবে আমন্ত্রণ।থ ১৯৫২ সালে সস্ত্রীক সুভাষ চলে যান বজবজে, ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের মজুর বস্তিতে, চটকল শ্রমিক মজদুর সংগঠনের কাজে। রাজনীতির তত্ত্ব এখানে এসে মেশে উষ্ণ মানবিকতায় নিভন্ত আগুনের চিতায় / জন্ম নেয় / মহিমান্বিত জীবন।এখানকার পাতাপচা ছ্যাৎলায় অ াকণ্ঠ বুজে যাওয়া পুকুর, বাঁশবাগানের ফাঁক দিয়ে গলে - আসে ফালি রোদ্দুর, কানে ভোঁ লাগার মতো বেজে-ওঠা ক ারখানার বাঁশি, চড়িয়ালের রাস্তায় হাফপ্যান্টপরা কোমরে গামছা বংধা মানুষের মিছিল, পসরা নিয়ে ফেরিওলার হাঁক, হাঁড়ি বগলে নিয়ে খালে মাছ ধরতে যাওয়া পাড়ার গিন্নিবান্নি মেয়ের দল, আজিজুলের মা-র আর্তি, নওসেরের মা-র ক ান্না, কলঙ্কের কালিমা-মাখা আমিনা, ঘর ভেঙে যাওয়া ফতিমার দীর্ঘশ্বাস, বাপের আদুরে মেয়ে গোলাপজান, এক বুক স াদা দাড়ি নিয়ে একা নিঃশব্দে সুতোয় পাক দিতে থাকা বুড়ো বাপ জমিলা, ইমানীর তরজাওয়ালা গান, পাগল বাবর আ লি আর তার একমাত্র মেয়ে সালেমন, অ্যালবিয়ন - লোথিয়ানের বন্ধ গেটের সামনে হরতালী শ্রমিকদের মিছিল, হপ্তাব াজারে মিটিং -এ লাল ঝান্ডার নীচে হাঁ-করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাঁটাই হওয়া মজুরের দল -- সোনালি সুতোর পাকে পাকে জড়ানো টুকরো টুকরো এইসব জীবনচিত্র থেকেই সুভাষ সংগ্রহ করেছিলেন জীবনের রসদ। পাথেয়ও। কর্মমুখর জীবনের এইপর্বে একই সাথে চলতে থাকে পার্টি সংগঠনের কাজ, ট্রেড ইউনিয়নের কাজ, পরিচয় পত্রিকা সম্পাদনা। এবং লেখ ালেখিও।

১৯৬৪ - তে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু ভাগ হয়ে গেল। সুভাষ থেকে গেলেন পুরোনো পার্টি - শিবিরে। কিন্তুপার্টি - বিভাজন তাঁর বিচলিত বিশ্বাসের ওপর ফেলেছিল দীর্ঘ বিষাদের ছায়া। ১৯৬৭ - তে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দিলে আইন অমান্য আন্দেলনে তিনিও কারাদ্ধ হন। সত্তরের দশকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অতি বামপন্থী কার্যকলাপ তাঁর কবিচিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে। বিশেষত মূর্তিভাঙার রাজনীতি
কী গেল ? পাথরের সেই পুরনো মূর্তিটা?
ইস্, ভেঙে - ভেঙে ওরা আর কিছু রাখল না ?
এখনকার যে কী হাওয়া ? (পূর্বপক্ষ)
এ-রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে তিনি মেলাতে পারেন না। বরং এই দশকে তাঁকে স্বস্তি দেয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। ভূয়ো তত্ত্বের কবরের ওপর খোলা আকাশের নীচে পতপত করে উড়ছে তার পয়পতাকা। (ক্ষমা নেই)। ত্রমশ বিবর্তিত হতে থাকে তাঁর রাজনীতি - চিন্তা। ঝোঁক বাড়ে বাম - মূল্য ায়নের দিকে। পার্টি - রাজনীতি তাঁর কাছে যান্ত্রিক বলে মনে হয়

সব কিছু ছকে ফেলে ভাবা একরকমের যান্ত্রিকতা। আসলে বাঁধাধরাকে নড়িয়ে চড়িয়ে দেয় মানুষের মন। মন বেঁকে বসলে অনেক বজ্র আঁটুনিই হয়ে পড়বে ফসকা গেরো।
যান্ত্রিকতার একটা বড় দোষ, মানুষকে নিতান্তাই অবস্থার দাস বলে মনে করে। কিন্তু কলের এই হিসেবটাকে বদলে দেয়

কল্‌জে। যারা তা না মানে, তারা হাত পা ছুঁড়ে যতই প্রগতির কথা বলুক --- আদতে তাল ঠুকে সেযখানকার সেখানে থাকাতেই তারা বিশ্বাসী।
এরই মধ্যে থাকে ভয়, অনেক সন্দেহের বীজ। কাউকে বিশ্বাস নেই। চারদিকে গণ্ডি দাও। আত্মরক্ষা করো। আগেভাগে আক্রমণ করে আক্রমণ ঠেকাও। দখল বাড়াও ।
এ এক রকমের মানসিক রোগ।
(সবিনয় নিবেদন এই, ক্ষমা নেই, গদ্যসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৪, পৃ. ৩৮৭)
পরিশেষে পার্টির নীতি ও রণকৌশলের বিদ্ধে মতপার্থক্য এবং জরি কিছু রাজনৈতিক প্রশ্নে ১৯৮০ সালে তিনি মনের কথা খুলে বললেন। রীতিমতো ঘোষণা করে পার্টি ছেড়ে তিনি সরে দাঁড়ালেন।

মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তাদের জীবনের নানা সমস্যার
কথাই আমার লেকায়, কবিতায় তুলে ধরেছি
ছাত্রাবস্থা থেকেই লেখালেখির শু। সুভাষ তখন সত্যভামা ইন্সটিটিউশনের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। এই স্কুলের ম্যাগাজিন ফল্গু-তে ছাপা কশরসের গদ্য কথিকা-ই তার প্রথম প্রকাশিত রচনা। স্কুলের শিক্ষকবৃন্দের কাছে এই লেখা প্রশংসা পেলেও খুশি হননি তার শুভানুধ্যায়ীরা। বিশেষত অনুদি। বাধাটা এল তার কাছ থেকেই গদ্য লিখে লেখক হয়েছিস। তোকে আরেক ধাপ ওপরে উঠতে হবে। তোকে কবি হতে হবে। অর্থাৎ গদ্য লিখে ছাড়ান নেই। লিখতে হবে পদ্য। অনেক কসরত করে শেষ পর্যন্ত যে অপূর্ব বস্তুটি বেরোল, তার পঙক্তিটি ছিল কাপড়কাচে, কাপড় কাচাই ব্যবসা হল তার। সেই পদ্যলেখার যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা এইরকম কী পদ্য ! কী রিয়ালিস্টিক ! হবে না ? ওর জানালার পাশেই তো ধোপার পাট। এই সময় দিদির গ্রামের বাড়ি জয়রামপুরে জনৈক স্কুল শিক্ষক ছন্দের ভুল শুধরে দিয়ে তাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন শক্ত মাটিতে। কবিতা লেখার আসল পাঠের সেই শুভারম্ভ।

ভবানীপুর মিত্র স্কুলের শিক্ষক কালিদাস রায়ের অপার স্নেহ, স্কুল ম্যাগাজিন মৈত্রী-র সম্পাদনার দায়িত্ব, লোকনাথপুর গ্রামে বেড়াতে গিয়ে খটিকাকা - হাজুকাকাদের পুজোর দালানের কুলুঙ্গিতে সাজানো লাইব্রেরিতে পুরোনো প্রবাসী, ভারতবর্ষ, আত্মশক্তি, কল্লোল, কালি-কলম পত্রিকায়। ওই পত্রিকায় প্রকাশিত সকলের গান ও রোম্যান্টিক কবিতার সূত্রে কবিতাভবন-- এর আড্ডার আসরে তাঁর যাতায়াত। পরিচিত হন একে একে প্রবোধকুমার সান্যাল, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, আশোক মিত্র, বিষ্ণু দে, অণ মিত্রের সঙ্গে। ১৯৪০ সালে বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত হয় ২৩ টি কবিতা সংবলিত বত্রিশ পৃষ্ঠার প্রথম কাব্যগ্রন্থ পদাতিক। সুভাষ তখন স্কটিশচার্চ কলেজের সাম্মানিক দর্শনের ছাত্র। তারপর তো ইতিহাস। প্রিয়,ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য, / ধবংসের মুখোমুখি আমরা, বা কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না ? --- প্রবাদপ্রতিন এই সব পঙ্‌ক্তিমালা তখন সকলের মুখে মুখে। কবিতা পত্রিকায় (পৌষ সংখ্যা ১৯৪৭) পদাতিক-এর কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে বদ্ধদেব বসু লিখলেন দীর্ঘ প্রবন্ধ

সভাষ মুখোপাধ্যায় দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য প্রথমত, তিনি বোধ হয় প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না। এমনকি, প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাও তিনি লিখলেন না, কোনো অস্পষ্ট, মধুর সৌরভ তাঁর রচনায় নেই, যা সমর সেনেরও প্রথম কবিতাগুলিতে লক্ষণীয় ছিলো। দ্বিতীয়ত, কলাকৌশলে তাঁর দখল এতই অসামান্য যে কাব্যরচনায় তাঁর চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তিদেরও এই ক্ষুদ্র বইখানায় শিক্ষণীয় বস্তু আছে বলে মনে কবি।
(কালের পুতুল, নিউ এজ, জানুয়ারি, ১৯৫৯, পৃ. ৮০)

আধুনিক বাংলা কবিতায় এই প্রথম শোনা গেল নির্ভীক রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর। অভিজাতভাবে পথ চলতে অস্বীকার করে, সমষ্টিগত চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ সুভাষ কবিতাকে শুধু অস্ত্ররূপে ব্যবহার করলেন না, নবযুগ আনবার স্থির প্রত্যয়ে যুদ্ধের সজ্জা পড়ে এসে দাঁড়ালেন মেহনতি জনতার মিলিত অগ্রগতির পুরোভাগে। আবেদন জানালেন

কৃষক, মজুর ! তোমার শরণ---
জানি, আজ নেই অন্য গতি,
যে-পথে আসবে লাল প্রত্যুষ
সেই পথে নাও আমাকে টেনে।
(কানামাছির গান / পদাতিক)
ওই একই সালে কবিতাভবন থেকে প্রকাশিত আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত আধুনিক বাংলা কবিতা সংকলনে সসম্মানে স্থান দেওয়া হল পদাতিক -এর প্রত্যয়ী পথিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকেও।

চল্লিশের এই দশকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ছিল এককথায় ভয়াবহ। ইয়োরোপের সমগ্র প্রাঙ্গণ জুড়ে শুধু ফ্যাসিজমের নির্বিচার নিদাণতা। বিশ্বব্যপী ফ্যাসিবাদের বর্বরতার প্লাবনে সভ্যতা ও সংস্কৃতি তখন বিপন্ন। ১৯৪১ সালের ২২ জুন সমাজতন্ত্র ও প্রগতির দুর্গ সোভিয়েত রাশিয়া ফ্যাসিস্ট হিটলারের নাৎসি বাহিনি কর্তৃক আক্রান্ত হলে কমিউনিস্টরা এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ আখ্যায় ভূষিত করে। ৭ ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করলে সরাসরি জনযুদ্ধ আখ্যায় ভূষিত করে। ৭ ডিসেম্বর জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করলে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয় আমেরিকা। দুনিয়া জুড়ে এই ফ্যাসিবাদের বিদ্ধে দেশে দেশে গড়ে ওঠে প্রতিরোধ আন্দোলন। জগৎজোড়াএই প্রতিরোধ - সংগ্রামে সেদিন শামিল হয়েছিলেন বাংলার যে মার্কসবাদী শিল্পী সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। সংঘবদ্ধ জীবনের নক্ষত্রখচিত সমারোহে সর্বোপরি বন্দরে, বাজারে, মাঠে দেশে দেশে শ্রমিক - কিষাণ - ছাত্রদলের সম্মিলিত প্রতিধবনিতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন
জাগ্রত চল্লিশকোটি এখানে তৈয়ার।
ধারালো সঙীন দেবে বিজয়ী স্বাক্ষর
গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মৃত ধনতন্ত্রের কবর।
যে ক্লীব পালাবে তার মুক্তি নেই আর।
দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধীচির হাড়
ধবংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দায়ার ---
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার ।।
(প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার)

১৯৪২ সালের ৮ মার্চ ঢাকায় তণ কমিউনিস্ট কর্মী ও লেখক সোমেন চন্দ্র নিহত হন। ২৮ মার্চ কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট -এর লাইব্রেরি হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেড়ারেশনের উদ্যোগে সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিবিরোধী লেখক- শিল্পীদের সম্মেলনে গঠিত হয় ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙঘ। এই সঙেঘর সভাপতি হন অতুনচন্দ্র গুপ্ত এবং যুগ্ম - সম্পাদক কবি বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা সেদিনের বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের কতটা প্রাণিত করেছিল তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সোমেন চন্দের স্মৃতিতে দক্ষিণ কলকাতা ছাত্র ফেড়ারেশন কর্তৃক প্রকাশিত প্রাচীর সংকলনটি। এই সংকলনকে ইশ্‌তেহারের আকারে No Passaran নামে একটি ছোট্ট গদ্য রচনায় ঘোষিত হয়েছিল

বিশ্বমুতিকর দুর্গ বিপন্ন - দেশে দেশে মুক্তিকামীর দল শপথ নিল একটা বুলেট, একটি ফ্যাসিস্ট।
ভারতবর্ষে সেই প্রতিরোধের প্রাচীর উঠথে। তার তলায় খোঁড়া হচ্ছে বিশৃঙ্খলের কবর। মিছিলে, প্রাচীরপত্রে ধবনিত হচ্ছে বিপন্ন ভারতের আকাঙক্ষা হাতিয়ার চাই।
(বাংলার ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা, ১৯৭৫, পৃ. ৪৭)

এই প্রাচীর সংকলনেই প্রকাশিত হয় সুভাষের স্বেচ্ছাবাহিনীর গান -- জনযুদ্ধের প্রথম ফ্যাসিবাদ - বিরোধী গণসংগীত
বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ
খবো দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।

ওই সালেই ১৯-২০ ডিসেম্বর কলকাতা ঝিবিদ্যালয় ইনস্টিটিউট হলে ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ -এর ১ম বার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত হয় সুভাষ ও গোলাম কুদ্দুস সম্পাদিত ফ্যাসিবাদ বিরোধী কবিতা - সংকলন একসূত্রে। ভূমিকায় সুভাষ লেখেন

পূর্বতোরণে শত্রুর খরনখর, পশ্চিমে প্রতিহত ঝঞ্ঝাবাহিনী, শহীত সেবাস্তোপোলে আর দুর্জয় স্টালিগ্রাডে মুক্তিকামী দুনিয়ার বজ্রবাহু। হয় বাঞ্ছিত মুক্তি, নয় দাসত্ব - লাঞ্ছিত শৃঙ্খল -- দ্বিতীয় পথ নেই। যে -কেউ জীবনের পক্ষে, যে - কেউ স্বাধীনতার সমর্থক --- তাকেই আজ বর্বর ফ্যাসিস্টদের বিরোহী হতেইহবে। ভারতবর্ষ সেই সঙ্কটের সম্মুখীন বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বহুবার আক্রান্ত। আজ ঘোষণার দিন এসেছে, দিকে দিকে আন্দোলিত আওয়াজ লুব্ধ দস্যুর বুক আতঙ্কিত কক।
(বাংলার ফ্যাশিস্ট- বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা, ১৯৭৫, পৃ. ৭৪)

ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলন তখন কবি - শিল্পীদের কাছে আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র নয়, তা হয়ে উঠেছে আন্তর্জাতিক মুক্তি আন্দোলনেরই অন্যতম অঙ্গ। তাই স্বদেশকে মুক্ত করার আবেগে সুভাষের কবিতায় ঝলসে ওঠে প্রতিরোধের তীব্রস্বর
সীমান্তে উদ্যত খড়্গ
নিরস্ত্র দেশের বুকে অগ্নি জ্বালে প্রভুত্বের মদমত্ত বুট।
ঐক্যবদ্ধ জনতার সুংকৃত জোয়ারে
অহংকৃত মুখের চুট ---
চোখের পলকে ভেসে যাবে।
আমাদের মুষ্টিবদ্ধ হাতের জবাবে
মুক্তির দেয়াল দেবে দৃপ্ত প্রতিরোধ। (আহ্বান)

১৯৪৩ -এর মে মাসে বোম্বাই শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সঙেঘর তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন (২৩-২৯ মে)। এই সম্মেলনে যোগ দিতে অন্যান্য রাজ্যের মতো বাংলা থেকে গিয়েছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, চিন্মোহন সেহানবীশ, দেবব্রত ঝিাস, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও। বলা বাহুল্য, সেদিন যে ঐতিহাসিক ইন্দ্রজালে রাজনীতি আর সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটেছিল বাংলার সাংস্কৃতির আন্দোলনের ইতিহাসে তা এক স্মরণীয় অধ্যায়য় হিসেবে চিহিত হয়ে থাকবে।

১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানি চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হয়। ৩০ এপ্রিল বার্লিনের পতন ঘটে, রাইখস্ট্যাগের ওপর ওড়ে লাল ঝান্ডা। ৯ মে চেকোশ্লোভাকিয়া মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। দ্বিতীয়ঝিযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষে সূচিত হয়েছিল গণ-অভ্যুত্থানের এক নতুন ইতিহাস। কলকাতায় রশিদ আলি দিবস, বোম্বাইয়ে নৌবাহিনীর বিদ্রোহ, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্বে দেশজুড়ে ধর্মঘট ও হরতাল, ভয়াবহ সামপ্রদায়িক দাঙ্গা, তেভাগা সংগ্রাম --- চতুর্দিকের গণ আন্দোলনের জোয়ারে ভাসমান কবি সুভাষকোনো অবস্থাতেই দেশ মাটি এবং মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হননি। সাম্যবাদী কবিদের মধ্যে দেশের মাটির সঙ্গে সুভাষের যোগাযোগ সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ। তাই তাঁর

পক্ষে এই উদাত্ত ঘোষণা করা সম্ভবপর হয়েছিল

এদেশ আমার গর্ব,
এ মাটি আমার কাছে সোনা।
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।
এখানে আমার পাশে
হিমাচল,
কন্যাকুমারিকা।
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ঐক্য
প্রতিজ্ঞা পরিখা।
(ঘোষণা)

১৯৪৮-এ প্রকাশিত হয় সুভাষের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ অগ্নিকোণ। কমিউনিস্ট পার্টি তখন বেআইনি। বিনা বিচারে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় আড়াই বছর ভোগ করে কারাজীবন। ১৯৫০-এ বেরোয় চিরকুট। ১৯৫১, পরে ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত। এই দশকটি তাঁর সাহিত্যজীবনের সব থেকে সৃষ্টিশীল পর্ব। বজবজের ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের বস্তিতে তত্ত্ব ও জীবনচারণার মধ্যে সেতুবন্ধ তো ছিলই, সেই সঙ্গে একের পর এক প্রকাশিত হয় নাজিম হিকমতের কবিতার বাংলা অনুবাদ, অনুদিত উপন্যাস কত ক্ষুধা, রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ, অক্ষরে অক্ষরে, কথার কথা, দেশবিদেশে রূপকথাক, ছোটে াদের জন্য সংক্ষেপিত বাঙালীর ইতিহাস, ভূতের বেগার। সৃষ্টির এই ধারা অব্যাহত থাকে ষাটের দশকেও। যত দূরেই য াই, কাল মধুমাস কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও বেরোয় যখন যেখানে, ডাকবাংলার ডায়েরি, নারদের ডায়েরি, যেতে যেতে দেখা রিপোর্টাজ, শ গল্প সঞ্চয়ন। সর্বোপরি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৩ তিন বছর সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যৌথভাবে ছোটোদের বিখ্য াত সন্দেশ পত্রিকার নবপর্যায়ের সম্পাদনাও। ষাটের দশক থেকেই তিনি সংলিপ্ত থাকেন আফ্রো - এশিয়ান রাইটার্স অ্য াসোসিয়েশন এর বিভিন্ন রকম কাজে। এই সূত্রে পরিচিত হন বিশ্বের খ্যাতনামা কবি ও লেখকদের সঙ্গে। সত্তরের দশকে এই ভাই, ছেলে গেছে বনে, একটু পা চালিয়ে, ভাই কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও প্রকাশিত হয় স্মরণীয় উপন্যাস হাংরাস, কে কোথায় য ায়। পরের দুই দশকে উল্লেখযোগ্য বই -এর মধ্যে রয়েছে ধর্মের কল, ফুল ফুটুক কাব্য, পাবলো নেদার আরো কবিতা, হ াফেজের কবিতা, অম শতক, গাথা সপ্তশতী অনুবাদ কাব্য, অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ, কাঁচা - পাকা, কমরেড, কথা কও উপন্যাস, আবার ডাকবাংলার ডাকে, খোলা মনে রিপোর্টাজ, আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, ঢে ালগোবিন্দর মনে ছিল এই, টানাপোড়নের মাঝখানে স্মৃতিকথা, কবিতার বোঝাপড়া প্রবন্ধ।

সাধারণ মানুষ, সাধারণের মতোই চলে যেতে চাই
যিনি ছিলেন সংগ্রামের শিল্পী সৈনিক, দেষ মাটির আর মানুষের প্রতি যাঁর ভালোবাসা ছিল অপ্রমেয়, সেই কালের রাখ াল পদাতিক কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ৮৪ বছরের দীর্ঘ পথ - হাঁটা শেষ হয়ে গেল ২০০৩ সালের ৮ জুলাই, মঙ্গলব ার, কলকাতার বেল ভিউ ক্লিনিকে, সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে। তাঁর ইচ্ছে ছিল, সাধারণের মতো চলে যাবার। দুর্ভাগ্য, সে-ইচ্ছে তাঁর অপূর্ণই রয়ে গেল। জীবনের অন্তিম মুহূর্তে, রোগশয্যায় তিনি লিখেছিলেন, তুমি কোন্ দলে / পা যে - দিকে চলে--- শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর ভর করে তিনি পা রেখেছিলেন তাঁর নিজের রাস্তায়।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com